নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (Nrvijnana Patrika), ISSN: 1680-0621, সংখ্যা ২৬, পৃ. ১-১৪
© ২০২১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

'পাগড়ি হঠাও'ঃ শরীর, পোশাক ও ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক পরিচালন

সুমিত কান্তি ঘোষ*

১. ভূমিকা

আধুনিক মানুষের জীবনে 'কি পরিধান করব', 'কিভাবে পরিধান করব' - এই প্রশ্নগুলো তার প্রাত্যহিক সামাজিকতা, রাজনৈতিক মনন, সাংস্কৃতিক মনন, লৈঙ্গিক ভাবনা এবং সর্বোপরি আত্মপরিচিতির সাথে সচেতন বা অবচেতনভাবে সম্পৃক্ত। নৃতাত্ত্বিক Emma Tarlo ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির নানাহতায় বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পারিচ্ছদিক উপকরণ কিভাবে একটা জাতীয়তার ধারণাকে অর্থবহ করে তুলেছিল - বিষয়টাকে বিদ্যায়তনিক আলোচনার প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে ভারতবর্ষের সামাজিক নৃতত্ত্ব এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, পোশাক যখন লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যবহৃত একটি উপকরণের গন্ডিকে অতিক্রম করে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরির মাধ্যমে পরিণত হয়, সেই পোশাক তখন সচেতন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের চাবিকাঠি (Tarlo, 1996)। Jennifer Craik (1993) অবশ্য বলেছিলেন, পোশাক যখন ব্যক্তির সচেতন বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম, তখন সেই পোশাককে ব্যক্তির নিজের বস্তুদেহের উপর চাপানো মুখোশও বলা যায়। সেই ক্ষেত্রে কাপড়ের প্রতিটা টুকরো হয় বাজারি অর্থনীতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মনে জায়গা করে নেয়, নতুবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা ব্যক্তিদেহের উপর চাপানো হয় বা ক্ষমতার মোহে ব্যক্তির 'body politics'এ জায়গা করে নেয় (Windy Parkins (Ed.), 2002)। সুতরাং স্থান কাল ভেদে পোশাকের সামাজিক ভাষাকে তুলে আনা সম্ভব। Alison Lurie ও পোশাকের সামাজিক ভাষ্যকে তুলে আনতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The Language of Cloths' কে আগে বুঝতে হবে। অবশ্য অচেতন পোশাকের বাঙময় পোশাকে রূপগ্রহ করবার একটা পথ আছে। Tarlo'র মতে সেই পথটা হল, পোশাকের নির্মাণ- অবনির্মাণ- বিনির্মাণের পথ। Tarlo'র ভাষায় 'dress', 'undress' এবং 're-dress'। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক Pierre Bourdieu বলেছেন, যেকোনো সমাজে মানুষের রুচিশীলতার নির্মিতি দাঁড়িয়ে থাকে সেই সমাজে উদ্ভূত ঐতিহাসিক সময়ের উপর। যে সময়টা কি না মানুষের স্থিত অভ্যাসকে, মানুষের স্থিত সাংস্কৃতিক পুঁজিকে নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক পালাবদলের ক্ষেত্রের সামনে এনে রুচিশীলতার অনুশীলনে পরিবর্তনকে সূচিত করে (Bourdieu, 1996)। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সময়টাকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগকে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক পুঁজি ও বিলিতি রুচিশীলতার আদান-প্রদানের একটা সন্ধিক্ষণ বলা যায়। যে সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে এদেশীয় সংস্কৃতিতে মুঘলী সংস্কৃতির অবদানের সাথে নবাগত ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক পুঁজির আদান-প্রদান শুরু হয়। Tarlo ভারতবর্ষের বহুধাবিভক্ত সামাজিক আচরণে এই বহুমুখীন আদান-প্রদানের মধ্য থেকে কেবলমাত্র পোশাকি আদান-প্রদানকে বুঝতে নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যগুলোর নীরবতা জনিত সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। অবশ্য সেই নীরবতাকে ভাঙবার জন্য নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের তিনি মহাফেজখানর অব-নির্মিতির প্রয়োজনীয়তার নিদান দিয়েছেন। সেই কারণেই হয়ত ক্ষমতাশালীদের মর্জির দাস রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা থেকে আহরিত তথ্যাদির উপর ততটা গুরুত্ব তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বরং মহাফেজখানার বাইরে

* ডক্টরাল রিসার্চার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ইমেইল: ghoshsumit1994@gmail.com

বেরিয়ে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পোশাক, ছবি, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, গুজরাটের কারিগরি গ্রামে তাঁর সাথে কারিগরদের প্রত্যক্ষ মেলামেশার অভিজ্ঞতাই একজন সামাজিক নৃতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি তাঁর 'Clothing Matters' গ্রন্থে উন্মোচন করেছেন। কিন্তু যেহেতু আলোচনার পরতে পরতে তিনি Bourdieu বর্ণিত ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের তত্ত্বকে ছুঁয়ে থেকেছেন, সে কারণে ইতিহাসের বিদ্যায়তনিক আঙ্গিনায় তাঁর কাজটি ঐতিহাসিকদের সামনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে বলা যায়। কিন্তু আমার বক্তব্য হল ভারতবর্ষীয় সামাজিক নৃতত্ত্বে পোশাকের সাথে সামাজিক ও জাতীয় পরিচিতির যোগটাকে আরো গভীরে গিয়ে বুঝতে হলে রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানাকে এড়িয়ে যাওয়াও সমীচীন নয়। রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত পরিচ্ছদ সম্পর্কিত ভাষ্যকে ঐতিহাসিকের আতস কাঁচে পুনঃনির্মিতির প্রয়োজন আছে। অবশ্যই সেই পুনঃনির্মিতির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সময়কালের পোশাকি রাজনীতিকে এবং শরীর, পোশাক ও ক্ষমতার সম্পর্কটিকে বুঝতে আমাদেরকে আন্তঃশৃঙ্খলিত পদ্ধতিবিদ্যার পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে।

এই পদ্ধতিবিদ্যায় সরকারি ও বেসরকারি তথ্যসূত্রের মাধ্যমে প্রথমে দেখা হবে, ভারতীয় জনজাতির শরীর এবং পোশাক সম্পর্কিত জ্ঞানাহরনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বে দেহ-রাজনীতি তথা 'বডি পলিটিক্স' এর একটা আবর্ত কেমনভাবে তৈরি হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে ব্রিটিশ সরকার এখানকার শাসন ব্যবস্থাপনায় তথা ঔপনিবেশিক রাজনীতির ক্ষমতার প্রকল্পে কিরূপে ব্যবহার করেছিল। তাছাড়া বাংলার নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা সরকারি চাকুরিজীবী শ্রেণি সেই পোশাকি ক্ষমতার প্রকল্পে জারিত হয়ে আত্মপরিচিতির কোন সন্ধিক্ষণে নিজেদের উপনীত করতে পেরেছিল। আর এই পুরো বিষয়টির ব্যাখ্যাকে দাঁড় করানোর জন্য মূলত ঔপনিবেশিক সরকারি এবং বেসরকারি নথি পত্র, বিলিতি আদবকায়দা সম্পর্কিত ম্যানার বুক এবং উনবিংশ শতকে সাদা সাহেবদের আঁকা চিত্রে নেটিভ আচার-বিচার, শরীর ও পোশাকের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং মহাফেজখানার সরকারি নথিপত্রে সেই নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নানাহ বৈষম্যসূচক পোশাক সংক্রান্ত নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি রাখব। যেহেতু এই পুরো আলোচনাটি দাঁড়িয়ে আছে, দেহ-রাজনীতির একটা অন্যতম ভিত্তি পোশাকের উপর, সেহেতু পোশাকের সাথে দেহ-রাজনীতির সম্পর্কটা আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে একটু দেখে নিতে হবে। উইন্ডি পারকিন্স দেখিয়েছেন, মধ্য এবং আদি মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজার বস্তু-শরীরকে পুতশরীরে তথা দৈব শরীরে রূপান্তরিত করা হত নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে। যার মূল কারণই হল, রাজদেহের সাথে দৈবত্বের সম্বন্ধ বিধান করে, রাজাকে সর্বজনের গণ্য ও মান্যতে পরিণত করা (Windy Parkins (Ed.), 2002:2-3)। এমনকি একই বিষয় মুঘল শাসনেও দেখেছি। সেখানেও সম্রাটকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে গণ্য করা হত। সম্রাটের উদ্দেশ্যে পাঠানো নজরানা সম্রাট ছুঁয়ে দিলেই তা কবুল হয়ে যেত। সম্রাটকে তা ভোগ করতে হত না। মিরজো এফ রাজদেহের সাথে রাষ্ট্রের সম্বন্ধের নিবিড়তা নির্দেশ করে বলেছেন, রাজদেহ অনুপস্থিত থাকলে, রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে দৃশ্যায়িত করা মুশকিল হয়ে যায়। সেকারণে বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র যখন উৎখাত হয়ে যায়, তখন ফ্রান্সের সার্বভৌম অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে (Mirzoeff, 1995:61)। অর্থাৎ রাজদেহ বা রাজনীতির সাথে যুক্ত সমষ্টির দেহকে যুগ যুগ ধরে প্রজার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে প্রজার মনস্তত্ত্বে সম্ভ্রমের বাতাবরণ তৈরি করে মান্যতা আদায় করা যায়। ডেভিড কুচটার মতে, এই মান্যতা আদায়ের প্রক্রিয়ায় পোশাক একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ পোশাকের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার একটা দৃশ্যমান পরিসর সর্বসাধারণের মনস্তত্ত্বে প্রকট হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে রোব, ক্লোক পরিহিতরা ছিলেন সমাজের কাছে গণ্যমান্য রাজপুরুষ। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দিকে ইংল্যান্ডে তথা পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের কালে এসে রাজদরবার লক্ষ্য করল, মধ্যযুগীয় আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক তৈরির পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সেই ব্যয় রাজকোষ আর বহন করতে পারছে না। তাই ইংল্যান্ডের রাজদরবার অপেক্ষাকৃত কম আড়ম্বরপূর্ণ কোট, ওয়েস্টকোট,

ট্রাউজারস অর্থাৎ থ্রি-পিস স্যুটের ফ্যাশনকে যুগ উপযোগী ফ্যাশন বলে প্রাধান্য দিয়ে মধ্যযুগীয় আড়ম্বরপূর্ণ ফ্যাশনকে দরবারি রাজনীতির জন্য 'অপুরুষোচিত' বলে দাগিয়ে দিয়ে, মানুষকে সেই ফ্যাশন অনুশীলনে হতোদ্যম করতে চেয়েছিল এবং সমর্থও হয়েছিল (David Kuchta, 2002:.4-7)। কারণ মানব প্রকৃতির একটা অমোঘ সত্য হল, তারা পরিস্থিতির দাবি মেনে চলে। যে পোশাক পরিধান করে তারা অবস্থিত রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় সুরক্ষিত বোধ করতে পারবে, সেই পোশাকই তারা পরিধান করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। রীতা ফেলস্কি একে প্রতীকি রাজনৈতিক অনুশীলন বলেছেন (Rita Felski, 1995:150)। যে অনুশীলন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দেহকে কেন্দ্র করে পোশাক ধারণ ও বর্জনের উপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। উপনিবেশিক ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকে পাগড়ির প্রশ্নে সেই অনুশীলনের ইচ্ছা কিভাবে দেহ-রাজনীতিকে প্রণোদনা দিয়েছিল তা দেখা যাক।

২. ‘নেটিভ’এর শরীর এবং পোশাকঃ ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বে দেহ-রাজনীতির নির্মিতি

১৭৭০ এর দশকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Robert Orme ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এখানকার ধনী ব্যক্তিও ঘরে অর্ধউলঙ্গ হয়ে থাকেন এবং এই অবস্থায় তাদের অতিথি অভ্যাগতদের সাথে বার্তালাপ করতেও দ্বিধা নেই।....কিন্তু এদেশের বস্ত্রশিল্প জগতখ্যাত।’ (Robert Orme, 1805: 472) অর্থাৎ মসলিন, কালিকোতে জগতখ্যাত ভারতবর্ষের মানুষই যে অর্ধউলঙ্গ থাকে এটা পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের একটা রূপকল্প তৈরি করতে সাহায্য করেছে বৈকি! বলা বাহুল্য Orme এক্ষেত্রে পারিবারিক পরিসরে যে ‘অর্ধউলঙ্গ’ অর্থাৎ ঊর্ধ্বাঙ্গে বস্ত্রহীন ও নিম্নাঙ্গে ধুতি পরিহিত যে দেশীয় ধনীদের কথা বলতে চেয়েছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই শ্রেণি হিন্দু বা তাঁর ভাষায় Gentoo হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ হিন্দুরাই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে কোনোরূপ সেলাই করা পোশাক পরতেন না। মুঘলদের সাথে বাণিজ্যিক ও শাসনতান্ত্রিক কারবারে তাঁদের তো অবশ্য মুঘল সময়কালের মান্য দরবারি পোশাকই পরতে হত। এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে যখন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখনো অর্থাৎ বিলিতি রুচির প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকট হওয়ার কালেও অনেক হিন্দুদের মধ্যে বাইরের পরিসরে সামাজিকতা রক্ষায় মোঘলী পোশাকের জনপ্রিয়তাই বেশী ছিল। উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর নকশায় যেমন চকবাজারের বাবু প্যালানাথের কথা বলেছেন, যিনি কিনা নিজের ব্যক্তিগত পরিসরে একজন সাত্ত্বিক হিন্দু। তিনি ‘একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোশ ও উত্থান ও শয়নে নির্জলা করে থাকেন।’ আবার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নিজের ব্যবসায়িক কারবারকে সচল রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি ১২১৯ বঙ্গাব্দে সারবর্ণ সাহেবের কাছে তিনমাস ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছিলেন ইংরেজের সাথে কারবারের প্রয়োজনে। কিন্তু বাবুর ইংরেজি কেতা ভালো লাগে না। বরং ‘মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবারাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ।’ তাই ‘লখনউ ফ্যাশানে চুড়িদাড়, পায়জামা, রামজামা, কোমড়ে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমতো পোশাক (Orme ২০১৩:১৮)।’ Orme আরেক জায়গায় রাজন্য এবং রাজন্যদের সাথে সংযুক্ত শ্রেণির পোশাকের মধ্যে ফারাকের কথা বলছেন। তাঁর মতে, রাজন্য ও তাঁর সাথে সংযুক্ত শ্রেণির পোশাকি উপকরণ অর্থাৎ চুড়িদার, রামজামা, পায়জামা ইত্যাদির মধ্যে ফারাক ছিল না। কিন্তু রাজন্য ও তাঁর অধীনে কর্মরতদের পোশাকের কাপড়ে একটা বড় বিভাজন ছিল। দরবারি সংস্কৃতিতে যার স্থান যত উঁচুতে হত, তিনি ততই দামি, সুক্ষ্ম কাপড় পরিধান করতেন বলে তাঁর অভিমত। তাঁর ভাষায়, ‘The richest man in the empire affects no other advantage in dress, but that of linen extremely fine.’[১] তিনি আরো বলেছেন, দরবারের সাথে বা সরকারী কাজের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত সদাসর্বদা মণিমানিক্যও শরীরে ধারণ করতেন না।[২] মুঘল আমলে ক্ষমতাধরদের পোশাকি সংস্কৃতিকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার সুবাদে ঐতিহাসিক Robert Orme তাঁর গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতা লিখে যেতে পেরেছেন। কিন্তু পেশাদারি নৃতাত্ত্বিকের চোখে এদেশীয় পোশাকি সংস্কৃতির

অভিমুখকে নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা যায়নি। যে কারণে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মহলেও সঠিক জ্ঞানের অভাবে প্রাচ্যদেশীয় জীবনযাপন অদ্ভুতুরে ঠেকত।

১৮৫৩ সালে 'The New York Daily' এ Karl Marx'এর 'The East India Question' প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লিখছেন, রাজপ্রাসাদ সর্বস্ব মুঘল সাম্রাজ্যের বৃদ্ধ অধিপতি 'হিন্দুস্তানী নর্তকী'দের মতন নাটকীয় পোশাক পরে সিংহাসনে বসে থেকে অলস সময় কাটান এবং প্রজা ও রাজপুরুষদের কাছ থেকে মোটা কর, উপঢৌকন ও খিলাত আদায় করে জীবন অতিবাহিত করেন।[৩] বোঝাই যাচ্ছে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের বিষয়ে মার্ক্স এই কথাগুলি বলছেন। কিন্তু মার্ক্সের বক্তব্যে মোঘল শাসকের পরিচ্ছদ নিয়ে বক্তব্যটা লক্ষনীয়। এবং এটাও অনুমেয় যে, পাশ্চাত্য সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যদি প্রাচ্যের পোশাকি সংস্কৃতি নিয়ে এরকম মতামত পোষণ করেন, তাহলে সেখানকার সাধারণ মানুষের মতামতটা কেমন হবে! সে কারণেই হয়ত ভারতবর্ষ থেকে নুন্যতম ভারতীয় প্রভাব অর্জন করে স্বদেশে ফেরা ব্রিটিশদের স্বদেশীয় সমাজে 'Nabob' বলে ব্যঙ্গের সম্মুখীন হতে হত।[৪] অর্থাৎ এদেশীয় পোশাকি সংস্কৃতি, রুচিবোধ ইত্যাদি বিষয়ে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ঔদার্য্য নিয়ে সংশয় আছে। কারণ সেই ঔদার্য্যের পথে হাঁটলে শাসকের পক্ষে, শাসক ও শাসিতের বিভাজনকে রক্ষা করা সম্ভব হত না। ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ শাসনের ভোর তখন কিন্তু ফারুকাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট জন শোর মুঘলী ধরণের জোব্বা পড়ে ক্রান্তীয় জলবায়ুর অঞ্চলে শরীরকে সুস্থ রাখবার জন্য এবং এই অঞ্চলের মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য অফিসে বা বাইরের আরো বিভিন্ন কাজ-কর্মে যেতেন।[৫] অষ্টাদশ শতকের মুঘলী মিনিয়েচার চিত্রকলাতেও আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিশিয়াল জন উম্বওয়েল আওয়াধি ঘরানার জোব্বা পরে, পাগড়ি ও কোমড়বন্ধ পরে, সূক্ষ্ম কাজ করা গালিচার উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে কিভাবে হুকা সেবন করছেন।[৬] হঠাত দর্শনে তাঁকে বিলিতি বলে চিহ্নিত করবার জো নেই। হাতরালে এরকম আরো উদাহরণ পাওয়া যাবে। উইলিয়ম ডালরিমপল হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট জেমস কারকপ্যাট্রিকের (১৭৯৮-১৮০৫) মধ্যে দেশীয় মোঘলী রুচির সাথে বিলিতি রুচির মিশ্রণকে তুলে ধরেছেন। ১৭৯৮ সালে রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি মুসলমানি কায়দায় পোশাক পরবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পরও তিনি সেই প্রচেষ্টা ছাড়েননি। শুধুমাত্র কোম্পানির আদেশকে সম্মান জানিয়ে কোম্পানির মিলিটারি অফিসারদের সম্ভাষণের ক্ষেত্রে বা নিজামের দরবারে কোম্পানির অফিশিয়াল হিসেবে অংশ গ্রহণ করবার সময় তিনি বিলিতি ফ্যাশনের পোশাক পরতেন। এমনি সময় তিনি দেশীয়দের মতো হুকাতে ধূমপান, দেশীয় স্টাইলে গোঁফ রাখা, মুঘলদের মতো ছোটো করে চুলে ছাঁট দেওয়া, মুসলমান রাজপুরুষদের মতো হাতের আঙুলে মেহেদি লাগানো, সবটাই করতেন।[৭] অর্থাৎ কারকপ্যাট্রিক একসাথে দুটো শরীরকে লালন করছিলেন। একটা শরীর ব্রিটিশ কায়দায় পোশাক পরে নিজামের দরবারে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব করত, আরেকটি প্রতিনিধিত্ব করত তাঁর রাজনৈতিক নম্রতাকে। একজন মোঘলী পোশাক পরতে অভ্যস্থ অফিসিয়ালকে রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের ঊষালগ্নে কোম্পানি পোশাককে কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে কিনা, এই প্রশ্নটাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ ১৮৩০ এর দশকে উপনীত হতে হতেই দেখা যায় কোম্পানি মোঘলী ধরণে পোশাক পরতে অভ্যস্থ অফিশিয়ালদের বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে থাকে। কারণ কোম্পানি তখন একক ক্ষমতাশালী হিসেবে উপনীত হয়েছে। মোঘলী পোশাক অফিসিয়ালরা গায়ে চাপাবে, এ যেন পূর্বেকার শাসকদের রুচির কাছে বশ্যতা স্বীকার। যেন কোম্পানির পুরুস্কারের দেশীয় প্রজাবর্গের সামনে ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সমকক্ষ। তাই কোম্পানি ১৮৩০ এর দশকেই বাইরে-ঘরে ইংরেজদের পোশাক বিধি নির্দিষ্ট করে দিয়ে ড্রেস কোড চালু করে। যে ড্রেস কোড অনুসারে কোম্পানি অফিসিয়ালরা হ্যাট, কোট, প্যান্টালুন, বুট না পড়ে কোম্পানির কাজে যোগ দিলে তা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ১৮৩৭ সালে জন শোর শাসিতদের পোশাক পরে,

কিভাবে প্রজাদরদি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা যেত, সে বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, নবাগত ব্রিটিশ অফিশিয়ালরা যখন বিলিতি রুচির পোশাক পরে নেটিভদের শাসন করতে আসেন, নেটিভরা কিন্তু বাহ্যিক রূপ দেখেই সসম্ভ্রমে তাঁদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। তাঁর বক্তব্য হল, নবাগত অফিশিয়ালদের সাথে নেটিভদের সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য অফিসিয়ালদের নিজেদের আজন্ম লালিত পোশাকি সংস্কৃতির বাইরে বেরিয়ে আসা দরকার ছিল।[৮] পরোক্ষভাবে কিন্তু সোর এর মতামত পূর্বের মোঘল পোশাকি সংস্কৃতির সাথে এদেশীয় পোশাকি সংস্কৃতির গতায়তের পথটা যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশের জন্য উপযুক্ত ছিল, সেই বিষয়টির দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।[৯]

কিন্তু সেই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের পক্ষে কেন সুবিধার নয়, সেই বিষয়ে উনিশ শতকের কুড়ি-তিরিশের দশকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ডাক্তার জেমস জন্সন তাঁর মতামতকে যুক্তিতে মুড়ে পরিবেশন করেছেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্দ্র জলবায়ুতে নবাগত ব্রিটিশদের মধ্যে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে তিনি বলছেন, নবাগতরা লিনেন কাপড়ের প্রসাধণ গায়ে না চাপিয়ে হাল্কা সুতি বা দরিয়া কাপড়ের ভেস্ট পরে থাকতে পারেন। এতে এই গরমের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষাও হবে আবার নিজেদের রুচির স্বকীয়তা রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সহজ হবে। এ প্রসঙ্গে নেটিভদের ত্বকের সাথে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে আগতদের ত্বকের পার্থক্য তুলে ধরতে, গঙ্গাবক্ষে আদুল গায়ে ইংরেজদের বজরার দাঁড় টানার কাজ করা, খাটো ধুতি পরিহিত নাইয়াদের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। যারা কিনা ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঘেমে- নেয়ে, শারীরিক কোনো অস্বস্তি ছাড়াই এরকম স্বল্প বসন পরা অবস্থাতেই দাঁড় বেয়ে যান। স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারেই যে ব্যক্তির চালচলন নির্ধারিত হয়, তা তিনি ভারতীয় মাঝিদের মধ্যে এই ধরনের অভ্যাসের পিছনে মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর যুক্তি অনুসারে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের ত্বকে রোমকূপের সংস্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষের চাইতে ভিন্ন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের রোমকূপ থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত এবং চ্যাটচ্যাটে ঘাম তীব্র গরমেও ত্বকের কোমলতা রক্ষা করে এবং রোমকূপকে রেচন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত রাখে। কিন্তু ইউরোপীয়দের রোমকূপের সংস্থান অন্য রকম হওয়ায়, তাদের ঘামের সাথে ওই বিশেষ তৈলাক্ত তরল নিঃসৃত হয়না। যার ফলে তাঁদের ত্বকের নমনীয়তা নষ্ট হয়।[১০] সুতরাং জন্সনের বক্তব্য হল, ক্রান্তীয় গরমে ব্রিটিশদের ত্বক কোনোভাবে বস্ত্রহীন বা উন্মুক্ত হওয়া সমীচীন নয়। জন্সন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অন্যান্য বৃত্তির নেটিভদের পোশাকের মধ্যে পাগড়ি ও কোমড়বন্ধের কথা বলেছেন। ক্রান্তীয় সূর্যের প্রখর তাপ থেকে মাথাকে বাঁচাতে নেটিভদের মধ্যে পাগড়ি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেছেন। আবার অন্যদিকে এদেশীয় শীতের শুষ্কতায় অন্ত্রাশয়ের কার্যকারিতাকে ঠিকঠাক রাখবার জন্য কোমড়বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ কোমড় বন্ধনী অন্ত্রাসয়ের মধ্যে ভিসেরাকে সংরক্ষিত করে শীতের ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাঁর মতে ইউরোপীয়দের যদি ভারতে এসে নেটিভদের পরিচ্ছদ শৈলী থেকে কিছু অনুকরণ করতে হয়, তা অবশ্যই এই কোমড় বন্ধনী হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য বহু ইউরোপীয় এদেশীয় জল হাওয়া সহ্য করতে না পেরে আন্ত্রিক ও আমাশয়ে ভুগতেন।[১১] সুতরাং এই আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয়রা এই দেশে এসে নেটিভদের মতো পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিল এবং এদেশের জল-হাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে শুরু করল, এমনটা ভাবা ভুল হবে। কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের শারীরবৃত্তীয় সুস্থতার পক্ষেও নেটিভদের পোশাকি রুচিকে আহরণ করা ইউরোপীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবে তৎকালীন সাহিত্যগুলোতে কিভাবে দেখানোর চেষ্টা চলেছিল, তার খানিকটা আঁচ উপরের আলোচনা আমাদের দিচ্ছে।

সুতরাং অপেশাদারি ঔপনিবেশিক নৃতত্ত্বে শরীর এবং পোশাকের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিধানের চেষ্টা উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে করা হয়েছিল, সেই চেষ্টায় প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে এদেশীয় সনাতন পোশাকি রুচির আদান-প্রদানের বিষয়টিকে বুঝে নিয়ে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে

ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেদের শরীরকে প্রজাদের সামনে কিভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন-- সেই বিষয়টিও প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বললেই নয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যতই বাড়তে থাকে ততই এদেশের শিল্পকলার সাথে তাঁদের আদান-প্রদানও বাড়তে থাকে। এদেশীয় মানুষের জীবন যাপন, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-আশাক এমনকি গাছ-পালা, পশু-পাখি ইত্যাদি বিষয়ে কোম্পানি অফিশিয়ালদের পৃষ্টপোষকতায় মুঘল কারখানার চিত্রকররা অনেক ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবিগুলো ভারতবর্ষের মানুষের পোশাকি সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রণালী, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ নিয়ে কোম্পানির অফিশিয়ালদের সামনে একটা জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে বৈকি।[১২] উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে বালথাজার সলভিনস থেকে শুরু করে চার্লস ডয়েলি প্রমুখ ইংরেজ চিত্রকরও বাংলা দেশের মাঠে ঘাটে, জনপদে ঘুরে ঘুরে এদেশীয় জীবনযাত্রার মূল ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বে সেই দৃশ্যমাধ্যমগুলোর অবদানকেও অস্বীকার করবার জো নেই। [১৩] সেই সব দৃশ্য মাধ্যমকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নেটিভদের পরিচ্ছদ শৈলীর দিকে ব্রিটিশরা কিভাবে তাকিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ছবিতেই একটা সাধারণ বিষয় ছিল, মুটে মজুর, পালকি বরদার থেকে শুরু করে রাজপুরুষ, অভিজাতরা পাগড়ি পরেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিকিধারী সাত্ত্বিক হিন্দুরা হয়ত পাগড়ি পরেননি, কিন্তু কাজের সূত্রে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে ওঠা বসার ক্ষেত্রে আদব রক্ষার জন্য ইংরেজের কাছাকাছি থাকা বা তারও আগে মুঘলদের কাছাকাছি থাকা হিন্দুরাও পাগড়ি পরেছেন। অবশ্যই পাগড়ির সাথে ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় প্রখর সূর্যের তাপ থেকে মাথাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কটাকে ভুলে গেলেও চলবে না।

৩. 'এটিকেট বুক' এবং উপনিবেশিক সরকারের আইনে দেহ-রাজনীতির প্রয়োগ

উপরে বর্ণিত ছবিগুলো অঙ্কিত হবার অনেক দশক পরে অর্থাৎ ১৮৯০ এর দশকের দিকে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে একটা চিঠি রেভেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন ডিভিশনের কমিশনার, ডিসট্রিক্ট অফিসার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার, সিভিল হাসপাতালের ইন্সপেক্টর জেনারেল ইত্যাদি আরো অনেক সরকারি বিভাগের কাছে পাঠিয়ে জানানো হয়েছিল, সরকারি কাজে নেটিভ ক্লার্ক বা মুহুরীরা যেন অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন এবং অন্যায্য পোশাক পরিধাণ করে না আসেন।[১৪] প্রশ্ন জাগে, অফিস কাছারিতে পরবার জন্য ন্যায্য পোশাক তাহলে কোনটি। চিঠির মতে, অর্থাৎ নেটিভদের জন্য অফিস কাছাড়িতে পরবার সরকার নির্ধারিত পোশাক ধুতি-চাদর নয় বা হ্যাট-কোট-প্যান্টালুনও নয়। বরং মুঘল আমলের সরকারী পোশাক চোগা বা চাপকান এবং ট্রাউজার্স।[১৫] সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে এদেশ শাসন করে মোঘলরা এদেশে পোশাকে-আশাকে রুচির যে পরিসর তৈরি করেছিলেন, সেই পরিসরটাকেই ইংরেজরা দেহ-রাজনীতির ক্ষেত্র হিসেবে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। সেই দেহ-রাজনীতি মূলত সভ্যতা ও বন্যতার ঘেরেটোপে আবদ্ধ। নেটিভ হিন্দুদের ধুতির আড়ালে ত্বক দেখা যাওয়া বা শরীরের উর্দ্ধাংশ সেলাই বিহীন কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়ার চল, সাহেবদের কাছে পরিশীলিত রুচির পরিপন্থী ব্যাপার এবং বন্যতার সমকক্ষ। যে কারণে ‘Manners Book’গুলোতে বলা হত, কোনো নেটিভ হিন্দু যদি সাহেবি ভোজসভা বা পার্টিতে অংশগ্রহণ করার সময় ধুতি পরে যান, তাহলে তিনি যেন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা স্টকিং পরে গার্টার দিয়ে তা আটকাতে না ভোলেন। অর্থাৎ ধুতির পিছন দিক থেকে ত্বক দেখা যাওয়া ভিক্টোরীয় পোশাকি নৈতিকতায় নিন্দনীয় বিষয়।[১৬] সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধুতিকে যে অফিশিয়াল পোশাক হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে না, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তা বলে বিলিতি রুচির পোশাক পড়ে সরকারি অফিসে কাজে যাওয়ার ছাড়পত্র নেটিভ কেরানিরা কেন পেলেন না --- এই প্রশ্নটা আসা খুবই স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও আমরা ‘এটিকেট বুকে’র শরণাপন্ন হতে পারি। একটি এটিকেট বুকে বলা হচ্ছে, পুরষের পাশ্চাত্য পোশাকের পারিপাট্যে আর

যতই ঢিলেমি থাক, একটা কালো কোট সকল ঢিলেমিকে ঢেকে দিতে পারে। তা বলে সব পুরুষ এই ছাড়ের উপযুক্ত নয়। তাহলে কারা যোগ্য! বইটির ভাষায়, তাঁরা হলেন, 'The artist' এবং 'man of letters'। বইটিতে বলা হয়েছিল, সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের পোশাক পরিধানে যদি একটু হেরফেরও হয়, সেই হেরফের তাঁদের সম্মানের সামনে তুচ্ছ। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেই হেরফের নিন্দার যোগ্য।[১৭] W. T. Webb দেশীয় ভদ্র মহোদয়দের জন্য যে এটিকেট বুকটি লিখেছিলেন সেখানেও বিলিতি রুচিতে অশিক্ষিত প্রজাদের উদ্দেশ্যে বিলিতি রুচির এমন একটি পাঠ দেওয়া হয়েছিল, যে পাঠে উক্ত রুচির পোশাক গায়ে চাপাতে নেটিভরা দুবার ভাববেন। কেননা সেই পোশাক একবার গায়ে চাপিয়েই পরিধানকারীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, শাসক শ্রেণির পোশাক পরে শাসক শ্রেণির সামনে যেতে হলে তাঁকে পোশাকটি পরার প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কোন পরিস্থিতিতে, কখন মাথার ক্যাপ খুলতে হবে, ওয়েস্ট কোটের ভেতরে শার্টটা কতটা ইন করতে হবে, হাতের দস্তাতানাগুলো কখন খুলে রাখতে হবে, এইসব বিষয়ে সম্যক অবগত হয়েই বিলিতি পোশাক পরবার নিদান দেওয়া হয়েছে বইটিতে।[১৮] সুতরাং আমরা ধারণা করতে পারছি যে, এটিকেট বুকের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক রুচি যে একটা শৃঙ্খলার ব্যাপার, যেমন- তেমনভাবে অনুসরণ করবার উপকরণ নয়, বা সর্বোপরি তা যে শাসক শ্রেণির রুচি -- এই বিষয়টা খুব সুচতুর ভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক আইনের সাথে সাজুয্য রেখে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার বিভাজনটাকেও সুচারুভাবে এই ম্যানার বুক বা এটিকেট বুকগুলি তুলে ধরেছে । কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পোশাকি রুচি নির্ভর দেহ-রাজনীতিকে আরো গভীরভাবে বুঝতে আমাদের এবার সরকারি দলিল-দস্তাবেজের দিকে একটু পা বাড়াতে হবে।

৪. উনিশ শতকের শেষের দিকে উদ্ভূত পাগড়ি সমস্যা, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং আদের পোশাকি চেতনার রাজনৈতিক রূপ

দীর্ঘদিন যাবত ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির সাথে প্রথমে ব্যবসায়িক এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে মেলামেশা করে ব্রিটিশরা এদেশীয় কিছু আদব-কায়দা লক্ষ্য করেছিলেন। যেমন, এদেশীয় হিন্দুদের কাছে মন্দির যেমন পবিত্র, বাড়ির অন্দর মহলও তেমনি পবিত্র। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা জুতো খুলে প্রবেশ করে। জুতো খোলার সাথে সম্মান প্রদর্শনের সম্পর্ককে মাথায় রেখে ব্রিটিশরাও তাদের দরবারে নেটিভদের জুতো খুলে প্রবেশের বিষয়টিকে আইন হিসেবে লাগু করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইউরোপীয় যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে আলোকিত দেশীয় মধ্যবিত্তরা ধীরে ধীরে এবিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর জীবনীতে ছাত্র জীবনে চটিজুতো পরে স্কুল ইনস্পেক্টর উইড্রো সাহেবের অফিসে ঢুকে পড়ায় কিভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। সাহেবের মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "বুট জুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, চটি জুতা পায়ে দিয়া আসাতে আপনার মান গেল, এ নূতন নিয়ম। ইহা আমি কিরূপে বুঝিব।"[১৯] অবশ্য 'এ নূতন নিয়ম'এ ব্রিটিশের সামনে বুট জুতো পড়ে আসার ছাড়পত্রও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর এই রকম অনেক ছোটো ছোটো সান্ত্বনা দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের তরফে শিক্ষিত দেশীয়দের মানসিক শান্তি এবং সাম্রাজ্যের স্থিতি বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৮৬০ এর দশকে জুতো সমস্যার সমাধান সূত্র বের করে সরকারী রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'The same privilege should be allowed throughout the Bengal Presidency, otherwise there would arise grave, inconvenience if natives of positions and consequence, who had enjoyed this concession at the capital before the viceroy, were to be denied it before any British officers at the stations interior of the country.'[২০] অর্থাৎ রাজধানী কলিকাতায় গভর্নমেন্ট হাউসে ভাইসরয়ের সামনে ইউরোপীয় ফ্যাশনে জুতো পরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র পাওয়া দেশীয় মহোদয়দের যদি

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ব্রিটিশ অফিসারদের সামনে জুতো খুলে প্রবেশ করতে বলা হয়, এটা একটা উষ্মার পরিবেশ তৈরি করবে। এই লেখাটিকেই এক প্রকার ঢাল বানিয়ে মালদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণী কুমার ঘোষ দেশীয় চাকুরিজীবীদের মাথা থেকে পাগড়ির বোঝা নামাতে পিটিশন দাখিল করেন ১৮৮০ সালে। সুতরাং ঔপনিবেশিক চাকুরিজীবীদের ড্রেস কোডে পাগড়ি সমস্যা জুতো সমস্যার অনুবর্তী। যাই হোক, সেই পিটিশনে লেখা হয়, 'The history of civilization in all countries is history of the violation of national manners and customs.'[২১] অর্থাৎ তাঁর মতে সকল সভ্যতার ইতিহাসই আসলে নিজেদের আচার ব্যবহার এবং প্রথাকে ভেঙে নূতনের দিকে এগিয়ে যাবার ইতিহাস। এখানেই প্যিরে বর্দিউর নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উত্থানের সাথে সাথে মানুষের রুচিবোধ পাল্টে গিয়ে নতুন রুচির অনুশীলন সংক্রান্ত তত্ত্বটির যথার্থ্য। কারণ সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর আশেপাশেই রুচির ঘোরাফেরা। পোশাকের মাধ্যমে সেই রুচির ক্ষমতা কেন্দ্রিকতা সবসময় সোচ্চারভাবে প্রকাশিত না হলেও নিরুচ্চার ভাবে হলেও প্রকাশিত হয়। সেই নিরুচ্চারকে দেখিয়ে দেওয়াটাই হল সমাজতাত্ত্বিকের অন্যতম কর্তব্য। তাই তারিণী কুমার ঘোষের কাছে যা পোশাকি সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, বাস্তবিক অর্থে তা ছিল নিজেদের দেহকে বিলিতি রুচির পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য তৈরি করা। কারণ তাঁরা তাদের পূর্বতন শাসক তথা মুঘলদের পোশাকি রুচিকে সেকেলে ও অকার্যকরী বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্তির পর তাঁরা মনে করতে শুরু করেছিলেন, মুক্তির পথ হল শাসক শ্রেণিকে অনুসরণের ও অনুকরণের দ্বারা লব্ধ পথ।

অবশ্য পাগড়ি পরতে অসুবিধার কথা জানিয়ে তারিণী কুমার ঘোষ একটি ব্যবহারিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছেন, অফিসের মধ্যে পাগড়ি পরে থাকার ব্যাপারটি যেমন- তেমন, কিন্তু দেশীয় মহোদয়রা যখন গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্দুরে বাইরে কাজে যান, তখন মাথার উপর পাগড়িকে বোঝা মনে হয়। যেসব দেশীয় কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের উপর অর্পিত অঞ্চলের দায়িত্ব তদারকি করতে যান, ছুটতে থাকা ঘোড়ার উপর বসে মাথার পাগড়ি সামলানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি সবিনয়ে স্বীকার করছেন, এই সমস্যায় পড়ে বেশিরভাগ নেটিভরাই হালকা টুপি ব্যবহার করতে বাধ্য হন, সেকারণে পাগড়িটা আলাদা করে একটি বাক্সে পুরে নিয়ে তাঁদের চলতে হয়, যাতে শাসক শ্রেণীর উচ্চ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবার প্রয়োজন পড়বার আগেই পাগড়িটা পরে নেওয়া যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি অকপটভাবে 'অহেতুক' এবং 'বোঝা' শব্দ দুটোকে ব্যবহার করেছেন।[২২] কিন্তু এর পরক্ষণেই তিনি দাবি জানিয়েছেন, সরকার যদি ইউরোপীয় ফ্যাশনে জুতো পরে নেটিভ মহোদয়দের দরবার, কোর্ট অফ জাস্টিস, এবং যে কোনো ব্রিটিশ অফিশিয়ালের সামনে যাবার অনুমতি দিতে পারেন, তাহলে দেশীয় মহোদয়দেরকেও ব্রিটিশ মহোদয়দের মতো মাথায় হ্যাট পড়তে দিতে কি অসুবিধা, উচ্চতর কর্মকর্তাদের সামনে হ্যাট খুলে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ দিতে কি অসুবিধা![২৩] যেন তেন প্রকারেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সঞ্জাত রুচিকে অনুশীলন করে তারিণী কুমার ঘোষের পক্ষে পিটিশন স্বাক্ষরকারীরা যেন দলাদলির ইতিহাস থেকে জন্ম নেওয়া কলিকাতার নাগরিক পরিসরের মধ্যে একটা ক্ষমতাবান নাগরিক শ্রেণি তৈরি করতে চাইছিলেন। যারা বিলিতি রুচির আদব-কায়দা অনুশীলন করে দেশীয় সমাজে সম্ভ্রম ও মান্যতা পাবে। তারিণী কুমার ঘোষের আরেকটি বক্তব্যকে তুলে ধরলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তিনি বলছেন, তিনি জানেন, দেশীয় সমাজে এমন ব্যক্তিত্বরাও আছেন, যারা পাগড়িকে বাঙ্গালির জাতীয় পরিচ্ছদ মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, 'It (Pagri) is quite comfortable and appropriate and nothing national should be changed.'[২৪] তারিণী বাবু বলছেন, এরকম কোন ন্যাশানালের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যারা পাগড়িকে ন্যাশানাল পরিচ্ছদের অংশবিশেষ বলে দাবি করেন, তাঁদের রুচি এবং প্রতীতি বিষয়ে তিনি নাক গলাতে চান না। তিনি চান, তাঁর সাথে সহমত পোষণ করে যারা পাগড়ির বোঝা নামানোর পক্ষে পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের দাবি যেন সরকার বাহাদুর মঞ্জুর করেন।[২৫] অর্থাৎ পাগড়িকে মাথা

থেকে নামানোর জন্য তারিণী কুমার ঘোষের অভিমত যে মধ্যবিত্ত সমাজের সকলের অভিমত নয়, সেটা আমরা তাঁর বক্তব্য থেকেই বুঝতে পারছি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে ভারতী থেকে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে বলেছেন, 'নকল করিতে হয়তো মুসলমানের নকল ছাড়িয়া, ইংরাজের নকল করাতে আমি কোনো হীনত্ব দেখি না। কারণ প্রথমত, এ মুসলমানি রাজত্ব নয়, ইংরাজী রাজত্ব। দ্বিতীয়ত-- মুসলমান জাতির অনুকরণ করার চেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সভ্য ইংরাজের অনুকরণ কেন না করি।'[২৬] কিন্তু প্রশ্ন হল, যে কোটটা, প্যান্টালুনটা কিনে দেশীয় ভদ্র মহোদয়দের ইংরেজের সামনে তা পরে যেতে দুবার ভাবতে হয়, যে কোট-প্যান্টালুন দেশীয়রা তাঁদের ইংরাজ প্রভুদের সামনে নিজেদের মতো স্টাইলে পরে যেতে পারেন না, সেই পোশাকে প্রাণের আরামের চাইতে অপমানটাই তো বেশি। কিন্তু দেশীয় ভদ্রলোকেদের কাছে প্রভু ইংরেজের সামনে যা অপমানকর, তাই আবার স্বদেশীয় সমাজের সামনে সম্মানের। কারণ চেতন-অবচেতনে সকলের কাছেই রাজার অনুগামী পোশাক মানে সম্মানের পোশাক। তাই তারিণী কুমার ঘোষ চিঠিতে বিলেত ফেরত দেশীয়দের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন, ওঁরা বিলাত থেকে দেশে ফিরে এসে নির্দ্বিধায় মাথায় হ্যাট, ক্যাপ পড়ে যত্রতত্র ঘোরেন। সম্মান জ্ঞাপনের জন্য হ্যাট বা টুপি খুলে হাতে নেন। তাহলে তাঁদেরকে কেন নিজেদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে সরকারী অফিসে পাগড়ি পরতে হবে![২৭] তারিণী কুমার ঘোষ এবং তাঁর সমর্থনে পিটিশনে স্বাক্ষরকারী মহোদয়রা পাগড়িকে ইউরোপীয়দের সাথে দেশীয় শিক্ষিত চাকুরিজীবীদের মেলামেশা র পথে অন্তরায় বলে মনে করেছেন। সেহেতু শাসকের পোশাকি সংস্কৃতিকে সরকারীভাবে লাভের জন্য মুখিয়ে থাকা মাথার উপর, পাগড়িকে বাড়তি চাপ বলে মনে হয়েছিল। তাই তাঁদের বক্তব্য, এই চাপমুক্তি সম্পর্কে যদি সরকার বাহাদুরের তরফে কোনো সদুত্তর না আসে তাহলে, তাদের মধ্যে নৈতিক হতাশার জন্ম হবে। আর প্রজাপুঞ্জকে হতাশার কবল থেকে মুক্ত রাখা অভিভাবক সুলভ সরকারের কর্তব্য-- সরকারের খেয়ালের উপর বিশ্বাস রেখে এই রকমভাবেই পিটিশন শেষ হয়েছে।[২৮] সাথে জুতো সমস্যা সংক্রান্ত পিটিশনের একটা বাক্য, 'any matter connected with the official position which he occupies.'--- ব্যবহার করে তারিণী কুমার ঘোষ বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্তত তাদের অফিসিয়াল অবস্থানের কথা বিবেচনা করে সরকার পাগড়ি সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন করতে পারেন।[২৯] কারণ তাঁরা তাঁদের অধঃস্তন দেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে একই রকম পরিচ্ছদ শৈলী ভাগ করে নেয়াটাকে কোথাও নিজেদের সম্মানের কম তেজের কারণ বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। পোশাকে-আশাকে বাবুয়ানি দেখিয়ে কলিকাতা নগরে হামবড়া ভাব সঞ্জাত দলাদলি আমরা উনবিংশ শতকের নকশা সাহিত্যে আকছার দেখতে পাই। তারিণী কুমার ঘোষদের পাগড়ি সংক্রান্ত পিটিশনকেও সেই দলাদলির অংশবিশেষ বললে ভুল হবে না। আবার ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলের স্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাথে চাকরি-বাকরি, নানাহ নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে যে আবেদন-নিবেদন নীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তারিণী কুমার ঘোষের নাগরিক চেতনাও সেই নীতিতেই আটকে ছিল। সেখানে বিলিতি রুচির শেকল ভেঙ্গে দেশীয় পরিচিতির আবাদের লক্ষণ তখনো প্রকট হয়নি।

৫. পাগড়ি প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শাসকের অবস্থান

তারিণী কুমার ঘোষরা না হয় পাগড়ি খুলে বিলাতি প্রথায় সম্মান জ্ঞাপনের সরকারি ছাড়পত্র আদায় করে, বিলাতি জীবনযাপনের উপর পুরোপুরি সরকারি শিলমোহর নেওয়ার পর্যায়ে একধাপ এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর জুতো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন মানে ইউরোপীয় এটিকেট অনুসারে চলার পূর্ণ ছাড়পত্র দেশীয়দের সমর্পণ করবেন, এটা ভাববারও কারণ নেই। কারণ ঔপনিবেশিক সরকারের মনে ভয় ছিল--- ইউরোপীয় এটিকেট অনুসারে চলার পূর্ণ ছাড়পত্র দেশীয়দের দিলে, যুগ যুগ ধরে ইউরোপের মাটিতে যেভাবে এটিকেটের সাথে রাজার দেহের সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে,

উপনিবেশ স্থাপনার পর উপনিবেশবাসীর সাথে উপনিবেশকারীর সম্পর্কে সেই দেহ যেভাবে সম্ভ্রম লাভ করেছে, সেই সম্ভ্রমের সুরটা কেটে যেতে পারে। সাম্রাজ্যের চলমানতার তাল কাটতে পারে। ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এস্লি ইডেন তারিণী কুমার ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীদের পিটিশন সম্বন্ধে যে নির্দেশিকা প্রকাশ করেন, সেখান থেকে এর আভাস মেলে। সেই নির্দেশিকায় তিনি বলেন, 'Attention to costume was a form of respect in which the forefathers were never deficient.'[৩০] অর্থাৎ পরিচ্ছদ ঐতিহ্যের বিষয়। সেটা স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ অনুসারে ধীরে ধীরে তৈরি হয়। সুতরাং তারিণী কুমার ঘোষের ''পাগড়ি আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদের উপকরণ নয়'' এই দাবি এই বক্তব্যের দ্বারা খারিজ হয়ে গেল। আর এই বক্তব্যটাও নীরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, ইংরাজি পারিচ্ছদিক আদব-কায়দা গ্রহণ করলেই ইংরেজের সমকক্ষ হওয়া যায় না। ইডেনের অর্ডারে তুলে ধরা আরো কিছু বক্তব্যকে পরিবেশন করলে, বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সেখানে বলা হচ্ছে, যারা ব্রিমলেস ক্যাপ পরে বলছেন, আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসারী, তারা আসলেই জানেন না, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিটা কি জিনিস! তারা জানেন না, ইউরোপীয় সমাজে কোনো সম্মানীয় ব্যক্তি ব্রিমলেস ক্যাপ পরে জন পরিসরে আসেন না। দেশীয়দের ইউরোপীয় পোশাকি আদব-কায়দা অনুসরণ করার সুযোগ দিলে, দেশীয়দের সাথে উপনিবেশকারীদের সামাজিক মেলামেশায় সুবিধা হবে, না হলে দেশীয়রা নৈতিক হতাশায় ভুগবেন--- তারিণী বাবুদের এই ধারণা লেফটেন্যান্ট গভর্নর পত্রপাঠ খারিজ করেছেন। তিনি বলছেন, ইউরোপীয়দের সাথে দেশীয়দের মেলামেশা তো অবস্থিত নিয়মেই ভাল আছে। এর চাইতে আর কি ভাল হতে পারে।[৩১] অর্থাৎ শাসকের সাথে শাসিতের যে রকম সম্পর্ক হওয়া উচিত উপনিবেশকারীর সাথে উপনিবেশবাসীর সম্পর্ক সে রকমই আছে। চলমান পোশাক সংক্রান্ত নিয়ম পাল্টে নতুন কোনো বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, 'In giving up the custom of appearing with the head covered on public occasions, native gentlemen are adopting neither the customs of the West nor of the East.'[৩২] অর্থাৎ দেশীয় ভদ্র মহোদয়রা এবং ইংরাজি শিক্ষিত যুবারা যে পোশাকে নিজেদের সজ্জিত করে পদস্থ ব্রিটিশ অফিশিয়ালদের সামনে হাজির হয়ে ইংরেজিয়ানা দেখানোর চেষ্টা করেন, সেই পোশাকটা না পাশ্চাত্য পোশাক, না দেশীয় পোশাক। সুতরাং মহোদয়দের উচিত এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে, যে পোশাক সংক্রান্ত কানুন তাঁদের জন্য নির্ধারিত আছে, সেটাকেই মেনে চলা। কিন্তু শেষে একটি আশার কথা তিনি বলেছেন, ভাইসরয়ের সাথে দেখা করতে যাতে কেউ না-ঘর কা, না ঘাট কা মার্কা পোশাক পরে না যান। যদি বিলিতি পোশাক পরার সাধ জাগে, তাহলে শুদ্ধ বিলিতি কায়দা মেনে সেই পোশাক পরতে হবে। যদি সেই কায়দা আয়ত্তে না থাকে, তাহলে সেই পোশাক না পরে আইনানুগ পোশাক পরাই শ্রেয়। পূর্বেই বলা হয়েছে বিলিতি কায়দা আয়ত্ত করবার পথটিকে কিরকম দুর্গমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এটিকেট বুকে। একটি উদাহরণ দিলে সেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভাইসরয়ের Levee বা প্রাতঃকালীন মজলিসে কোনো দেশীয় মহোদয় যদি ডাক পান, তাহলে তাঁকে হয় পুরো ভারতীয় পোশাক পরতে হবে, নতুবা পুরো বিলিতি ঢঙ্গে পোশাক পরতে হবে। ভাইসরয়ের সিংহাসনের কক্ষে প্রবেশ করতে হলে গায়ে জড়ানো শাল বাইরে খুলে রেখে প্রবেশ করতে হবে। গলায় কোনো কম্ফর্টার জড়ানো যাবে না। আবার ভারতীয়দের খিলাত বা সনদ প্রদানের অনুষ্ঠানে কোনো ভারতীয় সভ্য-ভদ্র পোশাক না পরে প্রবেশ করতে পারবেন না। ধুতি পরে গেলে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পায়ের পেছন দিকের ত্বক দেখা না যায়। দিশি জুতো পরে আসা চলবে না। শক্স ও স্টকিংসের সাথে বিলিতি ফ্যাশনের জুতো পরে আসতে হবে। বিলিতি ফ্যাশনের জুতো জোড়া পায়ের সাথে লেপ্টে থাকতে হবে, তবেই তিনি জুতো নিয়ে মজলিসে প্রবেশ করতে পারবেন। কেউ যদি ঢোলা বিলিতি জুতোও পরে আসেন, তাকে সে জুতো খুলেই দরবারে ঢুকতে হবে। আর দিশি জুতো পরে আসলে তো অবশ্যই তাঁকে জুতো খুলেই প্রবেশ করতে হবে।[৩৩] এটিকেট বুকের স্ববিরোধ এইখানেই যে, একদিকে তা দেশীয়দের আত্ম বিশ্বাসকেই

ভয়কে জয় করে ওঠার চাবিকাঠি বলছে, অন্যদিকে কেবলমাত্র প্রভুসুলভ শাসকদের চোখে অনেক ক্ষেত্রে কুরুচিকর ঠেকার কারণে দেশীয়দের নিজস্ব পরিচ্ছদ শৈলীর উপর বিলিতি রুচির প্রলেপ দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু বিলিতি রুচিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে কোনো আনকোরা দেশীয় পাছে সায়েব সেজে সায়েব প্রভুর সামনে আসেন, সেইজন্য সাজে-পোশাকে সায়েবিয়ানাকে একটা মহার্ঘ্য জিনিস হিসেবে দেখানো হয়েছে। যে মহার্ঘ্যের অনুপুঙ্খ অনুসরণ করবার মতো অর্থ বা মানসিক জোর ক্রান্তীয় আবহাওয়ার মানুষের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারিণী কুমার ঘোষের মতন মুষ্টিমেয় ব্রিটিশরাজের চাকুরেরা যখন মাথা থেকে পাগড়ি নামিয়ে নিজেদের পোশাকি আদবকে বিলিতি পারিচ্ছদিক রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিয়ে যেতে চান, তখন ব্রিটিশ অফিশিয়ালের প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের দেহ ও পোশাকি রাজনীতির স্বকীয়তা রক্ষায় কতটা সচেতন।

৬. উপসংহার

এই পুরো বিষয়টাকে দেহ, পোশাক ও ক্ষমতার পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের নিরিখে দেখলে বোঝা যায়, কিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত রুচি দেশীয়দেরকে মধ্যযুগীয় মোগল শাসন উদ্ভূত রুচির সাথে দ্বন্দ্বে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত পোশাকি রুচি যাতে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক দেহকে বা ক্ষমতার দেহকে কোনোভাবে ছুঁতে না পারে, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে ব্রিটিশ সরকার কিরকম কানুন প্রয়োগ করেছেন, এবং কানুনের সামগ্রিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। শুধু মাত্র যে সরকারি তরফেই এটা করা হচ্ছিল তা কিন্তু নয়। ১৮৯০ সালের দিকে দেশীয়দেরকে ব্রিটিশ আদব-কায়দা শেখানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু এটিকেট বুকও সেই চেষ্টা কিভাবে করেছে , তা দেখবার চেষ্টা আমরা করেছি। একটি এটিকেট বুকে মানুষের নীতিবোধ এবং নিঃস্বার্থ মনোভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ভয় সবসময় খারাপ নয়। ভয় থেকেও মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে। যদি তার মধ্যে নীতিবোধ থাকে। যদি নিজের প্রতি, নিজের গোষ্ঠীর প্রতি, নিজের প্রথা এবং কানুনের প্রতি বিশ্বাস থাকে। যদি ঠিক এবং ভুল বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা থাকে। যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তাবরণকে বজায় রেখে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে। এইসব থাকলে সভ্য চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয়।[৩৪] কিন্তু এইক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, নৈতিক এবং নিঃস্বার্থ চিন্তার কথা সত্যিই কি উপনিবেশকারীদের ক্ষেত্রে খাটে! যারা উপনিবেশবাসীদের মনে ভীতির নরবার্ট ইলিয়াস তাঁর 'Civilizing process' গ্রন্থে এই প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন। যদিও ব্রিটিশরা নতুন আবিষ্কৃত অঞ্চলে উপনিবেশ প্রসারকে নিজেদের স্বার্থে বলতে নারাজ। তারা সর্বদা দেখাতে চেয়েছেন, উপনিবেশ স্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থের চাইতে সভ্যতার প্রকল্প অনেক বেশি জড়িত। তাঁরা সভ্য বানানোর কর্মযজ্ঞে নিজেদেরকে সামিল মাত্র দাবি করেন। তাই নরবার্ট ইলিয়াস আবার প্রশ্ন তোলেন, এই সভ্যতার একমাত্রিক সংজ্ঞা তৈরি করবার মধ্য দিয়ে কি ক্ষমতা চরিতার্থ করবার এষণা কাজ করছে না? তিনি মধ্যযুগ ধরে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে বেগাড় খাটানো এবং শ্যিভালরি বা বীর ব্রতের নামে অমানবিক ক্রিয়াকর্মকে মাথায় রেখে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সময়টাকে কি আমরা আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপীয়দের সভ্যতার সময় বলতে পারি? পারি না। কিন্তু সেই সময়কে অতিক্রম করে, ইউরোপের বুকে নতুন যে ভালো সময়ের বিকাশ হয়েছে, সেটা একটা স্বাভাবিক বিকাশের ফল। প্রাগ-ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থাগুলোরও স্বাভাবিক বিকাশের একটা গতি ছিল। উপনিবেশ স্থাপনার পর সেই গতির নিজস্ব ধারাবাহিকতা কি বিঘ্নিত হয়নি! (Norbert Elias, 2000) হয়েছে বৈকি। গতির সকল জাড্যগুলোকে শাসক-শাসিত, ক্ষমতাধর- ক্ষমতাধীনের দ্বৈততায় বেঁধে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো দেহকে সেই দ্বৈততার আবর্তে এনে পোশাকি রাজনীতির যে ক্ষেত্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে তৈরি হয়েছিল, সেইটা ঔপনিবেশিকতার একটা অন্যতম রক্ষকবচ হিসেবে তো ব্যবহৃত হয়েছে, তার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি সেই রক্ষাকবচকে নিয়ে নিজেদের সামাজিক পরিসরে নিজেদের মতো করে কিভাবে খেলতে চেয়েছিল, তা আমরা তারিণী কুমার ঘোষের পাগড়ি সংক্রান্ত পিটিশন থেকেও এই আলোচনায় লক্ষ্য করলাম।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২০১৩, হুতোম প্যাঁচার নকশা, নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত, কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার।

ড. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৭, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, আত্মচরিত, কলিকাতা, প্রাবাসী কার্যালয়।

Balt Solvyns, 1804, The Costume of Hindostan, London: Published by Edward Orme, Printseller to his Majesty and the Royal Family.

Doglus Dewar, 1922, Bygone Days in India, London: John Lane the Bodily Head Ltd.

Frederick John Shore, 1837, Notes on Indian Affairs, Vol.1, London: John W. Parker.

G. P. Spear, 1932, The Nabobs: A Srudy of Social Life pf the English in Eighteenth Century, London: Humphery Milford & Oxford University Press.

George Routledge (1812-88), The publishing Date is not mentioned, Routledge's Manual of Etiquette, London: George Routledge and Son's Ltd.

James Johnson, 1824, The Influence of Tropical Climates on European Constitution, Vol.II, Philadelphia: Published by Thomas Dobson & Son.

Robert Orme, 1805, Historical Fragments of the Mogul Empire, London; Printed for F. Wingrave, in the Strand, Successor to the Mr. Nourse.

W.T. Webb, 1890, English Etiquette for Indian Gentlemen, Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition.

Dr Jayanta Sengupta Edited, March. 2014, Charle's D'Oyly's Calcutta: Early Nineteenth Century, Victoria Memorial Hall.

David Kuchta, 2002, The Three-Piece Suit and Modern Masculinity: England 1550-1850, Berkley, Los Angeles, London: University of California press.

Emma Tarlo, 1996, Clothing Matters: Dress and Identity in India, Chicago: The University of Chicago Press.

Jennifer Craik, 1993, The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion, London, New York: Routeledge.

Norbert Elias, 2000, The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, Translated by Edmund Jephcott, Oxford, Blackwell Publishing.

N. Mirzoeff, 1995, Bodyscape : Art, Modernity and the Ideal Figure, London and New York: Routledge.

Pierre Bourdieu, Eighth Printing 1996, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Richard Nice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Rita Felski, 1995, Gender of Modernity, Cambridge: Harvard University Press.

Windy Parkins (Ed.), 2002, Fashioning The Body Politic: Dress, Gender and Citizenship, Oxford, New York: Berg.

William Dalrymple, 2002, White Mughal, Gurgaon: Penguin Books.

William Dalrymple (Ed.), 2019, Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company, London: Bloomsbury Publishing Place.

Endnotes:

---

1. Robert Orme, 1805, Historical Fragments of the Mogul Empire, London; Printed for F. Wingrave, in the Strand, Successor to the Mr. Nourse, p.410

2. তদেব

3. তাঁর ভাষায়, '…the Great Mogul…is allowed $120,000 a year…a most heavy charge upon a people living on rice, and deprived on first necessaries of life….His authority does not extend beyond the wall of his palace, within which the Royal idiotic race, left to itself, propagates as freely as rabbits…There he sits on his throne, a little shriveled yellow old man, trimmed in a theatrical dress…much like that of dancing girls of Hindostan. On certain state occasions, the tinsel- covered puppet issues forth….strangers have to pay a fee… as to any other saltimbanque (street performer) exhibiting himself in public; while he in his turn, presents them with turbans, diamonds etc. [But] the Royal diamonds are…. ordinary glass, grossly painted [and] break in the hand like gingerbread.'

Karl Marx, July 25, 1853, The East India Question, Transcribed by Tony Brown, The New-York Daily Tribune, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/25.htm

4. G. P. Spear, 1932, The Nabobs: A Srudy of Social Life pf the English in Eighteenth Century, London: Humphery Milford & Oxford University Press

5. Doglus Dewar, 1922, Bygone Days in India, London: John Lane the Bodily Head Ltd., p.181

6. Unknown Artist, 1790, Portrait of John Wombwell Smoking a Hokah, Lucknow; নিয়েছি William Dalrymple (Ed.), 2019, Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company, London: Bloomsbury Publishing Place, p.37 থেকে।

7. William Dalrymple, 2002, White Mughal , Penguin Books, p.115

8. Frederick John Shore, 1837, Notes on Indian Affairs, Vol.1, London: John W. Parker, p.81

9. ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, '….তাহাদের (মুসলমানদের) শিল্পবিলাশ ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনি স্বভাবের অমোঘ নিয়মে, কেবল আপন বিপুলতা, আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপন করিয়া লিয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, কোট ও চাপকান, রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র থেকে, কলকাতাঃ কামিনী প্রকাশনালয়, পৃ। ৬৯৬

10. James Johnson, 1821, The Influence of Tropical Climates on European Constitution, Vol.II, Philadelphia: Published by Thomas Dobson & Son, pp. 232-240.

11. তদেব।

12. William Dalrymple (Ed.), 2019, Forgotten Masters: Indian Painting for the East India Company, London: Bloomsbury Publishing Place

13. Dr Jayanta Sengupta Edited . March. 2014, Charle's D'Oyly's Calcutta: Early Nineteenth Century, Victoria Memorial Hall. Balt. Solvyns, 1804, The Costume of Hindostan, London: Published by Edward Orme, Printseller to his Majesty and the Royal Family.

14. Order Regarding the Dress of Clerks in Govt. Offices, February 1892, General Miscellaneous File 2D-1, West Bengal State Archive, Kolkata

15. চিঠির ভাষায়, '…His Honour would suggest the use of the black Choga and Chapkan with black or white Trousers which are already very frequently worn. This is a very seemly and gentlemanly dress, and his honor would be glad to see it generally adopted.' তদেব।

16. W.T. Webb, 1890, English Etiquette for Indian Gentlemen, Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition, p. 19, 64

17. বইটির নিজস্ব ভাষায়, 'A French writer has said…that the artist and the man of letters needs only a black coat and the absence of all pretention to place him on the level of best society…..however,…this remark applies only to the intellectual workers, who if they do occassionally commit a minor solecism in dress or manners are forgiven on account of their fame and talents. Other individuals are compelled to study what we have elsewhere called the "by laws of society" .' George Routledge (1812-88), The publishing Date is not mentioned, Routledge's Manual of Etiquette, London: George Routledge and Son's Ltd, p.47

18. W.T. Webb, 1890, English Etiquette for Indian Gentlemen, (Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition , p. 37

19. শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, আত্মচরিত, কলিকাতা, প্রাবাসী কার্যালয়, পৃ। ৯৭-১০০

20. Resolution on the question of Native Gentleman being required at reception , public or private or in courts of Justice to appear with their shoe,19th March,1868, Proceeding No.20, Political Department, January, 1880.

21. To the Liutenent Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept.,WBSA

22. To the Liutenent Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept.,WBSA

23. তদেব।

24. তদেব।

25. তদেব।

26. ড. রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৭, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ। ৭৫৪।

27. চিঠির ভাষায়, 'the practice of wearing caps and hats, and of uncovering the head in token of respect, is as a matter of fact allowed in many cases--- notably in the case of natives who visit England, both during the stay in that country and after their return to India.'

To the Liutenent Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept., WBSA

28. তাঁর নিজের ভাষায় সে বক্তব্য তুলে ধরা যাক, 'We would submit to your honor's kind consideration that the enforced wearing of the Pagri against their sense of the fitness of things cannot but act as a cause of moral depression on the people whose welfare is entrusted to your Honor's care, that Government does not gain anything by such enforcement; and that it acts as a drawback to easy intercourse between European and native gentlemen, officially as well as socially.'

To the Liutenent Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept., WBSA

29. To the Liutenent Governor of Bengal, from Tarini Coomar Ghose, Deputy Magistrate of Malda, Proceeding No-19, January,1880, Political Dept., WBSA

30. Letter forwarded from the office of Liutenet Governor to Tarini Coomer Ghosh, Deputy Magistrate of Malda; Baboo Parbutty Charan Roy, Deputy Magistrate of Dacca; Baboo Chandra Coomer Dutta, Deputy Magistrate of Bukergunj; Moulvie Mohabat Ali, Moonsif of Goalundo; Baboo Mohini Mohan Chuckerbutty, Deputy Magistrate of Sahabad; Baboo Jodupati Banerjee, Deputy Magistrate of Comilla, Tipperah; Baboo Ram Chandra Mookerjee, Honorary Magistrate of Krishnanagar, Nuddea; February, 1880, Political Department, WBSA.

31. চিঠির ভাষায়, 'The Memorialist are much mistaken if they imagine that in wearing brimless caps, they are initiating European customs. No European of respectability would appear in public in such caps and they(memorialist) can not therefore claim as they do to associate its adoption with "Western Culture".' তদেব।

32. তদেব।

33. W.T. Webb, English Etiquette for Indian Gentlemen, (Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition 1890), p.19, 64

34. W.T. Webb, English Etiquette for Indian Gentlemen, (Calcutta: Thacker, Spink & Co, second Edition 1890), p.1